সাহেবের কবরখানা

শুজা রশীদ

নানা বাড়ি থেকে আমরা খুব ভোর বেলা রওনা দিলাম। রানী আপা প্রায় মাইলখানেক গরুর গাড়ির সাথে এলো। বুঝলাম তার গ্রামে মন টিকছে না। তেঁতুলিয়ার হাট পযন্ত এসে সে ফিরে গেলো। যতদূর দেখা যায় ফিরে ফিরে চেয়ে হাত নাড়লো। মা বললেন মেয়েটার বড় মায়ার প্রাণ।

আমার মনটা খারাপ হলো। রানী আপাকে আমাদের সাথে নিতে পারলেই ভালো হতো। কিন্তু ছোটদের ইচ্ছার কে মূল্য দেয়? দাদু দিন দু'য়েক পরে আমাদের তিনজনকে সঙ্গী করে খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। আলেক গরুর গাড়িতে আমাদেরকে কালীগঞ্জের হাট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলো। এখানে নৌকায় নদী পার হয়ে বাস ধরতে হয়। বাস সাতক্ষীরা হয়ে যায়। আমরা সাতক্ষীরায় চাচুর বাড়িতে এক রাতের জন্য থামলাম। চাচুর বাড়ি শহরের মধ্যে হলেও সেটাকে পুরোপুরি শহর বলা চলে না। তাদের দোতালা বাড়ির পেছনে দেয়াল ঘেরা বিশাল বাগান। আম, জাম, কাঠাল সবই আছে। মীনু আপা বাড়ির সামনে সুন্দর ফুলের বাগান করেছে। সেই বাগানে কত রঙের গোলাপ ফুটেছে! রুশী গোলাপ দেখলেই উত্তেজিত হয়ে উঠে। মীনু আপা তাকে বিশাল একখানা হলুদ গোলাপ দিলো। খুশীতে তার হাসি দুই কান ছুঁয়ে গেলো।

রাতে খাবার সময় চাচু গম্ভীর মুখে বললেন–সবাই যা ভেবেছিলো পরিস্থিতি হয়তো সেদিকেই গড়াচ্ছে। ন্যাশনাল এসেমব্লি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীর যাতায়াত বেড়ে গেছে। ইয়াহিয়া আর ভুট্টো মিলে কিছু একটা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। আমার কাছে ভালো ঠেকছে না।

দাদু বললেন–শুনলাম টিক্কা খানকে নাকি পূর্ব পাকিস্তানের মিলিটারি গভর্নর বানিয়েছে। কেউ মানবে এইসব?

চাচী সাধারণত এই জাতীয় আলাপে অংশগ্রহণ করেন না। আজ মনে হয় আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। বললেন- আল্লার গজব নামবে এই দেশে। এইসব বদমায়েশ আল্লাহ সহ্য করে না। আমার শুধু ভয় এই হিন্দু ঘরগুলোকে নিয়ে। আমার বাড়ির সামনে যুগ যুগ ধরে বসবাস করছে। গরীব মানুষেরা খেটে খুটে খায়। যুদ্ধ একটা বাঁধলে ওদের কি হবে?

চাচা হাসলেন। –ওদের কথা পরে ভেবো মীনুর মা। তোমার নিজের সংসারের কি হবে তাই ভাবো। মুসলমান বলে তুমি ওদের হাত থেকে ছাড়া পাবে তেমন ভাবছো কেন? যুদ্ধ হচ্ছে শয়তানের নিজের হাতে গড়া। কারো রক্ষা নেই।

খাওয়ার পরে কলেজের আরো দু'জন শিক্ষক এলেন। তারা চাচু-দাদুর সাথে দীর্ঘক্ষণ এইসব নিয়ে আলাপ করলেন। রাতে মাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখলাম। বুঝলাম তার ভয় করছে। বাবা কাছে না থাকায় নির্ভর করার মতো কেউ নেই। আমার ইচ্ছা হয় মাকে নির্ভয় করতে কিন্তু মায়ের ইদানিং যা কাঠ–খোট্টা ব্যবহার। তাতে ধমক খাবার সম্ভাবনা কম না। আমি শুধু মনে মনে বলি, আল্লাহ সব ঠিক করে দাও। সেই বয়েসের বিশ্বাসের বুঝি কোন তুলনা নেই।

পরদিনই আবার বাসে চাপলাম আমরা। গন্তব্য খুলনা শহর। বিশাল পেট নিয়ে চলাফেরায় মায়ের বেশ কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু উপায় কি? খুলনায় খালার বাড়িতে একবার উঠতে পারলে মায়ের আর কোথাও ঝট করে নড়বার ইচ্ছে নেই। মা সুযোগ পেলেই কথাটা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন।

আমাদের খুলনা পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। রিক্সায় উঠে 'মোসাব্বের উকিলের বাসায় যাবো' বলতেই তারা ঝড়ের মতো চালিয়ে সাহেবের কবরখানা সড়কের দোতালা একটি বাড়ির চওড়া লোহার গেটের সামনে আমাদেরকে নিয়ে এলো। এই গেট আমাদের অনেক পরিচিত। আমি আর রুশী লাফিয়ে নেমেই এক দৌড়ে ভেতরে চলে গেলাম। খালা-খালু জানতেন আমরা আজ আসবো। তারা আমাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। –কই, তোদের মা কোথায়?

মা যেন বোন-দুলাভাইকে দেখে একেবারেই কাবু হয়ে গেলেন। তাকে একরকম বহন করে বাসার মধ্যে আনতে হলো। আমাদের জন্য আলাদা একটা ঘর ঠিক করে রেখেছিলেন খালা। সেখানেই মাকে শুইয়ে দেয়া হলো। মা অকারণেই বোনকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদলেন। রুশী মাকে জড়িয়ে ধরে সে কান্নায় কণ্ঠ মেলালো। আমি মুখ বাঁকিয়ে ছাদে গেলাম। সাধারণত সন্ধ্যায় আমার খালাতো ভাইদের আড্ডা বসে সেখানে। মনি ভাই এবং রনি ভাই দু'জনেই আমার চেয়ে অনেক বড়। তাদের বেশ গাবদা-গোবদা শরীর, দু'জনই খুব ডাম্বল করে। এলাকার ছেলেরা সমঝে চলে। তাদের দু'জনার মস্তান বলে নাম ডাক আছে। খালার বাসার ছাদে অসমাপ্ত চিলেকোঠার মধ্যেই বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তাস খেলে তারা দু'জন। সবসময়েই তারা হাসিখুশি ফুর্তির মধ্যে আছে। অবশ্য দু'এক দিন পর পরই তাদের নিজেদের মধ্যে মারপিট লাগে। সারা পাড়ায় হৈ চৈ পড়ে যায়। ধস্তাধস্তি করবার চেয়ে ষাড়ের মতো চিৎকার করাতেই তাদের দক্ষতা বেশি।

লম্বা ছাদ পার হয়ে তবে চিলেকোঠায় যেতে হয়। ইলেকট্রিসিটি নেই সেখানে। হারিকেনের আলো জ্বেলে খেলা হয়। বেশ একটা গ্রামীন ভুতুড়ে ভাব। আমি ভয়ে ভয়ে চারদিকে চাই। খালা বাড়ির ঠিক পাশেই সাহেবদের কবরখানা। বস্তুত খৃষ্টানদের কবরখানা। শহরের মাঝখানে হঠাৎ এমন বড় সাইজের ভীতিকর একটা জায়গা তৈরী করবার কি উদ্দেশ্য কে জানে? কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি এই কবরখানায় বহু বিদেহী আত্মার চলাফেরা রয়েছে। গরমকালে মনি ও রনি ভাইয়ের সাথে খোলা ছাদে শুয়েছিলাম একবার। মাঝরাতে ঘুম ভাঙতে চোখ খুলে দেখি কয়েকটা আলোর বিন্দু ছুটাছুটি করছে ঠিক মাথার উপরে। আমি ভয়ে মড়ার মতো নিঃসাড়ে পড়ে থাকলাম। শুনেছি নড়াচড়া করলেই তারা এসে ঘাড়ে ভর করে। দেখতে জোনাকী পোকার মতো হলেও বস্তুত তারা অমানবীয় কিছু। সেটাই আমার খোলা ছাদে শেষ শোয়া।

কবরখানার পেছনেই খালার বাড়ির প্রায় পাঁচিল ছুঁয়ে কর্দমাক্ত একটা পুকুর। মশার রাজত্ব। সেই পুকুর ঘিরে বেশ অনেকগুলি ঘর। কয়েকটি হিন্দু পরিবারের বসবাস। তারা গরীব মানুষ, ছোট ছোট কুড়েঘরে বাস করে। প্রায় সর্বক্ষণই তারস্বরে ঝগড়া-ঝাটি করে। তাদের কারো বাসাতেই বিদ্যুৎ নেই। হারিকেনই ভরসা।

আমি সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ডাকলাম - মনি ভাই! রনি ভাই। বার কয়েক ডাকাডাকি করবার পর তাদের সাড়া মিললো। –কিরে, কখন পৌঁছালি তোরা? ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এখানে আয়।

আমি সাহস করে দ্রুত পায়ে হেঁটে চিলেকোঠায় গিয়ে ঢুকি। সিগ্রেটের ধোঁয়ায় টেকা দায়। কয়েকটা বিয়ারের বোতলও চোখে পড়লো। মনি ভাই চোখ টিপলো। কাউকে বলিস্‌নে যেন। বড় হলে এসব একটু আধটু করতে হয়। তুই যেন আবার খেয়ে ফেলিস্‌নে। শেষে মাতাল হয়ে কি কান্ড করবি! হা-হা-হা। বেশ একটা হাসির হুল্লোড় উঠলো।
রনি ভাই আমাকে তার কাছে টানলো।
–ওদের কথায় কান দিস না। আমার পাশে বয়। হাত খারাপ যাচ্ছে। খালাম্মার শরীর কেমন?
–যখন তখন অবস্থা। পেট ফুলে ঢোল।
আবার একটা হাসির রোল উঠলো। রনি ভাই বললো- ওভাবে বলতে হয় নারে, পাগল। নে, তাস তোল। দেখি তোর হাতে পয় আছে কিনা। টাকা-পয়সা চালাচালি হতে বুঝলাম ফ্লাশ খেলা চলছে। মনি ভাই জিতছে। আর সবাই হারছে। রনি ভাইও। আমি এসে তার ভাগ্যের বিশেষ পরিবর্তন হলো না।

রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে পেছনের গ্রিল দিয়ে ঘেরা প্রশস্ত বারান্দায় মা, খালা ও প্রতিবেশী কয়েকজন মহিলার সাথে বসে তাদের গল্প শুনি। রুশী অনেক আগেই ঘুমিয়ে কাত। মনি ভাই বাইরে কোথাও গেছে। রনি ভাই নীচে সিগ্রেট টানছে। খাবার পরপরই তাদের দু'জনারই সিগ্রেট খেতে হয়। খালু আজ খেতে আসেননি। তিনি উকিল মানুষ। মাঝে মাঝে প্রচন্ড কাজের চাপ থাকে। নাওয়া খাওয়া ভুলে যেতে হয়। এখন অবশ্য কাজের চাপ ওকালতি সংক্রান্ত নয়। তিনি মুসলিম লীগের নেতা গোছের মানুষ। আজ তার চেম্বারে স্থানীয় নেতাদের মিটিং বসেছে। একটু পরপরই বেশ জোর তর্কের শব্দ ভেসে আসছে। খালুর গলা সবার কণ্ঠ ছাড়িয়ে কানে আসছে –শেখ মুজিব এই দেশটাকে ভারতের হাতে বেচতে চায়। আমাদেরকে সে হিন্দুদের গোলাম বানাতে চায়। মুসলমান-মুসলমান আমরা এক সাথে থাকবো। সমস্যা যদি কিছু হয় সেটা আমরা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করবো। ভারতের দালালদের সাথে কোন আঁতাত চলবে না। কি বল তোমরা সবাই?
সমর্থনসূচক ঐক্যতান কানে এলো। খালু আরো উৎসাহ নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। খালাকে চিন্তিত মনে হলো। মাকে লক্ষ্য করে বলেন- মনি, রনির বাবাকে নিয়ে আমার ভয় হয়। এখন হচ্ছে আওয়ামী লীগের সমর্থন চারদিকে। মানুষ মুক্তি চায়। এইসব ধর্মের কথাবার্তায় কারো পেট ভরে না, মন ভরে না। মা বললেন – দুলাভাই পার্টি চেঞ্জ করে না কেন? এরকমতো সবাই করে। যখন যেটাতে সুবিধা। খালা মুখ বাঁকালেন – হ্যা, সে করবে তেমন কাজ? সবকিছুতে সততার পরাকাষ্টা দেখিয়ে ছাড়ে।
আমি ক্লান্ত হয়ে ছিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়লাম টেরও পেলাম না।
খালার বাড়ির প্রধান কতকগুলি আকর্ষণের দুটি ছিলো তাদের দীর্ঘদিনের কাজের ছেলে ইউনুস এবং একটা টিয়া পাখি। ইউনুসের ভয়ানক ভক্ত ছিলো সে। তার কাছেই বেশ কিছু কথা বলা শিখেছিলো। ইউনুসের বয়স সম্ভবত পনেরো ষোলো ছিলো। বদমায়েশের বদমায়েশ সর্বক্ষণ থুথু দিয়ে বিশাল বিশাল বুদবুদ বানাতো আর পাশের বাড়ির কাজের মেয়েদেরকে নিয়ে অশোভন সব ইঙ্গিত করতো। টিয়া পাখীটাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে শিখিয়েছিলে 'দুর হ, দুর হ', 'ও সুন্দরী', কই গেলি', 'উকিল সাব পয়সা মারে' এই জাতীয় আরো অনেক কিছু। মানুষজন কেউ তার সামনে গেলেই খাচার ভেতর থেকে টিয়া পাখীটা খেয়াল খুশী মতো একটা কথা ছুড়ে দিতো। খালুকে 'ও সুন্দরী .....' বলায় তিনি একদিন ভয়ানক ক্ষেপে গিয়ে পায়ের স্যান্ডেল খুলে ইউনুসকে সমানে পেটালেন। স্যান্ডেল ছিঁড়ে যাওয়ায় ইউনুসকেই আবার রাস্তার

ওপারের মুচির দোকান থেকে সেটি সেলাই করে আনতে হলো। ইউনুস কয়েকদিনের জন্য তার পৈতৃক বাড়িতে গিয়েছিলো। সে ফিরতে আমার একঘেমেয়ী পুরোপুরি কেটে গেলো। মনি ভাই ও রনি ভাই আমাকে খুবই আদর করে কিন্তু তারা সব সময় বড়দের মতো কথাবার্তা বলে। মনি ভাই বড়দের মতো চটুল কথা বলে, আর রনি ভাই গম্ভীর কথা বলে। তাদের সঙ্গ ভালো লাগলেও ঠিক জমে না। ইউনুস ফিরতেই আমাদের শহর ঘোরা শুরু হলো। সে কাজের ছেলে হলেও কাজ ছাড়া আর সবই সে করে। খালা এইজন্যে তাকে একদম দেখতে পারেন না। কিন্তু আবার তাড়িয়েও দিতে পারেন না। অনেক ছোটবেলায় তাকে তাদের হাতে দিয়ে গিয়েছিলো ইউনুসের বাবা। সে ঘরের ছেলের মতোই হয়ে গেছে। মারধর খালুর হাতে মাঝে মাঝে খায়, কিন্তু তাতে সে বিন্দুমাত্র দমে না। খালুর হাতে মনি ভাইও মাঝে মাঝে দু-চার ঘা খেয়ে থাকে। তাতে কি মনি ভাইয়ের জীবনে কিছু থেমে আছে? এই হচ্ছে ইউনুসের যুক্তি। আমাকে নিয়ে সে একটা ম্যাটিনি শোও দেখে ফেললো। বাড়িতে ফিরে রুশীকে আর মাকে সেই গল্প করার ফল বিশেষ ভালো হলো না। খালা ব্যালন দিয়ে ইউনুসের পিঠে ধাম করে একটা বাড়ি বসিয়ে দিলেন। –এইটুকু ছেলেকে নিয়ে তুই সিনেমা দেখতে গেছিস? লজ্জা করে না তোর?

ইউনুস আড়ালে গিয়েই থুথুর বুদবুদ তুলে মার খাওয়ার ঝাল ঝাড়লো। তার সঙ্গে থেকে থেকে আমিও বুদবুদ তোলার বিশেষ রকম দক্ষতা অর্জন করতে লাগলাম। রুশী মাকে বলে দেয়ায় আমাকে ভয়ানক বকা খেতে হলো। এটা নাকি অভদ্র কাজ। ইউনুস কেন করে জানতে চাওয়ায় মা চাঁপা স্বরে ধমকে বললেন- ওর কথা আলাদা ও কাজের ছেলে। তোর বাবা ডাক্তার। তুই ওর মতো কাজ কেন করবি?

ব্যাপারটা ঠিক মাথায় ঢুকলো না। তবে রুশী থেকে সাবধান থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। যতই বয়স বাড়ছে ততই তার নাড়ী পাতলা হচ্ছে। মেয়েগুলিকে নিয়ে খুবই ঝামেলা।

একদিন সকালে খালার হাতের বানানো রুটি আর পাশের ময়রার দোকানের সুস্বাদু রসগোল্লা দিয়ে মাত্র নাস্তা খেতে বসেছি হঠাৎ বিরাট গোলমালের শব্দে বাড়িশুদ্ধ কেঁপে উঠলো। প্রথম কিছুক্ষণ আমরা কিছুই বুঝলাম না। প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে যেতে বোঝা গেলো মনি ভাই ও রনি ভাইয়ের মধ্যে আবার গোলমাল বেঁধেছে। তারা দু'জনাই ষাড়ের মতো চেঁচাচ্ছে এবং একজন অন্য জনকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে। দু'জনার হাতেই দু'খানি ইয়া লম্বা বাঁশ। সেগুলো দিয়ে ক্রমাগত দেয়ালে বাড়ি মেরে তারা পরস্পরকে ঘায়েল করবার চেষ্টা করছে। খালা চিৎকার করতে লাগলেন - তোরা থামবি? তোদের কোন কান্ডজ্ঞান আছে?

মনি ভাই চোখ মুখ লাল করে, মুখে গ্যাঁজা তুলে খালার চেয়েও কণ্ঠ আরো কয়েককাঠি উপরে তুলে বললো- এই ব্যাটা ভারতের দালাল, আওয়ামী লীগের সাথে হাত মেলাতে চায়। আমরা মুসলিম, মুসলিমদের সাথে থাকবো। পাকিস্তানে পাকিস্তানে ভাই ভাই। তোদের মতো দালালদের আমরা গুলি করে মারবো.....

রনি ভাই সমান তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলো - চুপ কর ব্যাটা পাকিস্তানের পা চাটা। ওরা আমাদের খাওয়ায় না পরায়, যে ওদের কাছে আমাদের বান্ধা থাকতে হবে। শেখ মুজিব ঠিকই বলছে। ঐ শালাদের সাথে কোন কথা নাই। বহুত হইছে।

আবার দেয়ালে পটাপট লাঠির বাড়ি। খালা এবার মারমুখি হয়ে বললেন- তোরা কি দেয়ালটা ভাঙ্গবি? মারপিট করবি তো যা, বাইরে গিয়ে কর। আমার বাড়ির ক্ষতি করবি না।

টিয়া পাখী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করছে 'দুর হ দুর হ'। খালু চায়ের কাপ নিয়ে সবেমাত্র তার চেম্বারে বসেছিলেন। সেদিনের কেসগুলো নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করবেন। তিনি স্যান্ডেল হাতে ছুটে এলেন। দুই ভাইকেই বেশ কয়েক ঘা লাগালেন। দু'জনার কেউই তাতে বিশেষ বিড়ম্বনা বোধ করলো বলে মনে হলো না। তবে কাজ হলো। তারা লাঠিসোটা ফেলে হাতাহাতি করতে করতে রাস্তার দিকে চলে গেলো। খালু হাতের স্যান্ডলটা ইউনুসের পায়ের সামনে ছুড়ে দিলেন। যা দ্যাখ, ব্যাটা মুচি আছে কিনা। আমিও খাওয়া ফেলে ইউনুসের সাথে ছুটলাম মুচির কাছে। মুচির জুতা সেলাইয়ের অনুপম কৌশল দেখতে খুব ভালো লাগে। বড় হয়ে মুচি হবার আগ্রহ নেই কিন্তু ঐ জাতীয় যন্ত্রপাতি কিনে গোপনে একটু চেষ্টা করে দেখতে চাই। এমন ছন্দময়ভাবে কাজ করে সে।

রাতে সাধারণত সবাই একসাথে খাওয়া হয়। প্রায়শঃই বেশ দেরী হয়। রাত বারোটা বাজা অস্বাভাবিক নয়। বিকালে এক দফা চা-নাস্তা পর্ব সারা হওয়ায় সবারই ক্ষিধে পেতে পেতে মাঝরাত হয়। তাছাড়া খালুর চেম্বারেও সবসময়ই ভীড় লেগে থাকে। রাত গভীর না হলে কেউ খাবার নাম করে না। মনি ভাই ও রনি ভাইয়ের শেষ দফা গোলমালের কয়েক দিন পরে রাতে খাবার সময় খালুকে একটু বিচলিত মনে হলো। তিনি সাধারণত চুপচাপ খেতে পছন্দ করেন। তাকে কোন প্রশ্ন না করলে উত্তর দেন না। আজ তার ব্যতিক্রম হলো। মনি ভাই ও রনি ভাই আওয়ামী লীগ ও মুসলিম লীগ নিয়ে আবার তর্ক শুরু করবার পায়তারা করছিলো, তাদেরকে কষে একটা ধমক লাগিয়ে থামালেন। –শোনো সবাই, দিনকাল ভালো না। ইয়াহিয়া এবং মুজিবের আলাপে কোন সুরাহা হয়নি। অনেক পাকিস্তানী সৈন্য এখানে এসেছে। চারদিকে ধড়পাকড় শুরু হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তোমরা সবাই কথাবার্তা একটু সমঝে বলো। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন হওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু অকারণে ঝামেলায় জড়ানোর কোন কারণ নেই।

রনি ভাই দৃঢ় গলায় বললো - ওদের আমরা ভয় পাই নাকি? ইয়াহিয়ার গলা চেপে ধরে পশ্চিম পাকিস্তানে ছুঁড়ে ফেলে দেবো। ব্যাটা হারামি।
মনি ভাই খেঁকিয়ে উঠলো - চুপ কর তুই .....
খালু কড়া ধমক দিয়ে দু'জনকে থামালেন। - দেখো, এইসব নিয়ে এমন ছেলেমানুষের মতো ঝগড়া ঝাটি করো না। পরিস্থিতি কেমন হয় কিছুই বলা যায় না। মনে রেখো, সবার উপরে হচ্ছে পরিবার। ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ করো না। ভাই বোনের চেয়ে আপনজন আর কেউ নেই।
এমন গুরুগম্ভীর একট কথার মাঝখানে পাগলা টিয়াটা হঠাৎ বলে উঠলো - ও সুন্দরী, কই গেলি?
খালু তীক্ষ্ণ গলায় বললেন - এই বদমা'শটাকে কেউ লাঠি মেরে তাড়াতে পারিস না?
খালা বললো - অবলা পাখীর কি দোষ। ইউনুসটাইতো ওকে এইসব আজে বাজে কথা শিখিয়েছে।
খালু ইউনুসের খোঁজে চারদিকে তাকালেন। সে সুড়ুত করে রান্নাঘরের দিকে কেটে পড়লো।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ইউনুসের করুণ মুখ দেখেই বুঝলাম কোন ঝামেলা হয়েছে। তার নির্বাক অঙ্গুলি অনুসরণ করে বারান্দায় ঝোলানো শূণ্য খাঁচাটা দেখে বুঝলাম, সুন্দরী পালিয়েছে। কিভাবে কে জানে? ইউনুস এবং আমি বের হলাম টিয়া পাখিটাকে খুঁজে বের করতে। সারা শহর চষে বেড়িয়েও তার খোঁজ পাওয়া গেলো না। ইউনুসকে কখনো কাঁদতে দেখিনি। সেদিন সে দুই হাটুতে মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কাঁদলো।

দামামা

শেখ মুজিবর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষনের পর কারো মনেই কোন সন্দেহ ছিলো না যে বেশ বড়সড় একটা ঝামেলা পাকিয়ে উঠছে। মুজিবর রহমান উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' আমাদের মতো কম বয়েসী ছেলেদের মধ্যে এর প্রভাব ছিলো ভয়ানক। আমরা অনেকেই সুযোগ পেলেই চীৎকার করে সেই বক্তৃতা হুবহু বলে যেতাম। খুলনার খালার বাসাতেই একদিন বক্তৃতা দিতে গিয়ে মনি ভাইয়ের কাছে বকুনি খেলাম। সে মুসলিম লীগের সমর্থক। মুসলিমলীগ পাকিস্তানের একাত্বতায় বিশ্বাস করে। রনি ভাই সম্পূর্ণ বিপরীত। সে স্বাধীন বাংলাদেশ চায়। প্রায়শঃই সে প্রচন্ড আক্রোশ নিয়ে অনুযোগ করে। কেন মুজিব ৭ই মার্চেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি? এই বদমায়েশ পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে এতো দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকার কোন অর্থ আছে? হারামজাদা ইয়াহিয়া খান। হারামজাদা টিক্কা খান। সবকটাকে এবার জুতিয়ে বের করা দরকার। এই নিয়ে স্বভাবতই মনি ভাইয়ের সাথে তার তুমুল বাকবিতন্ডা শুরু হয়ে যায়।

২৫শে মার্চ রাতের আগেই অশনি সংকেত পাওয়া যাচ্ছিলো কিন্তু তা যে এমন বিভীষিকার রূপ নিয়ে আসবে তা বোধহয় কেউই ভাবেনি। রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানী সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়লো ঢাকার নিরীহ স্বাধীনতাকামী মানুষদের উপরে। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পুরানো ঢাকা। তারা পিলখানা 'ইপিআর বেস' আক্রমণ করে আকস্মিকভাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল তখন স্বাধীনতাকামী যুবকদের হেডকোয়ার্টার ছিলো, পাকিস্তানী আর্মির প্রধান লক্ষ্য ছিলো ইকবাল হল। মাঝরাতের কিছু পরেই মর্টার, মেশিনগানের সশব্দ আর্তনাদে ঢাকার বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। মৃতের রক্তে এবং আহতের বেদনাযুক্ত আর্তচিৎকারে চারদিক মথিত হলো। নীলক্ষেতের বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দিলো পাকবাহিনী। ভীতসন্ত্রস্ত বস্তিবাসীরা যখন পালানোর চেষ্টা করছে তখন তাদের উপর নির্বিচারে গুলি চালালো বর্বরের দল। আক্রমণ হলো জগন্নাথ হল ও অন্যান্য হলের উপরেও। মূল আক্রমণের পর হলের ভেতরে প্রবেশ করে নির্মমভাবে আহত এবং আটকা পড়া ছাত্রদেরকে গুলি করে হত্যা করা হলো।

এতো কিছু যখন হচ্ছে, আমি তখন গভীর ঘুমে অচেতন। মায়ের পাশে রুশী আর আমি শুই। সারাদিন এতো ছুটাছুটি হয় যে রাতের খাবার শেষ করে বিছানায় পিঠ ঠেকালেই দু'চোখের পাতা আঠার মতো আটকে আসে। রুশীর ঘুম বড় খারাপ। সে খাটময় ছুটাছুটি করে বেড়ায়। অন্যের গায়ের উপরে পা দেবারও তার অভ্যেস আছে। এমনকি সেও আমার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না। ইদানিং মায়ের অবস্থা খানিকটা বেগতিক। আগের চেয়েও বিশাল হয়েছেন তিনি। রাতে ঘন ঘন বাথরুম যেতে হয়। উঠতে গিয়ে প্রায়শঃই সমস্ত খাটে ভুমিকম্প

তোলেন। তাতেও আমার ঘুমের বিঘ্ন ঘটে না। তবে ২৫শে মার্চ রাতে সম্ভবত শেষ রাতের দিকে চিৎকার চেঁচামেচিতে আমার ঘুম সামান্য ছুটে যায়। রাস্তায় অনেক গোলমাল শুনলাম। মনে হলো রনি ভাইয়ের কণ্ঠও শুনলাম। সে ষাড়ের মতো চেঁচাচ্ছে - হারামজাদারা ভেবেছে আমাদেরকে গুলি করে থামাবে? এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। সবাই ওঠো। রেডিও শোনো। কুত্তার বাচ্চারা রক্তের দরিয়ায় ঢাকা শহর ভরিয়ে দিয়েছে। উঠো সবাই।

অন্য সময় হলে নির্ঘাত মনি ভাইয়ের ধমক শোনা যেতো। রাত বিরাতে উঠে এমন চিৎকার করার কোন অর্থ হয়? মনে হলো খালা-খালুও উঠেছেন। আমাকে ঘুম চোখে বিছানায় উঠে বসতে দেখে মা বললেন- শুয়ে পড় খোকা। এসব তুই বুঝবি না।
আমি কোন আপত্তি করি না। যদিও মাথার মধ্যে কৌতুহলের জীব ঘন ঘন উঁকি দেয় তবুও ঘুমের টানে বালিশে মাথা ঠেকাই। যখন উঠি তখন রৌদ্রোজ্জ্বল একটা দিন। ঘর থেকে বেরিয়েই টের পাই ভয়ানক কিছু একটা ঘটেছে। খালুর চেম্বারের দরজা বন্ধ। ভেতরে প্রচন্ড বাক-বিতন্ডা চলছে। নিশ্চয় খালুর দলের লোকজন সব এসেছে। অন্যদিনের মতো আজ আর খালুর কণ্ঠ বেশী শোনা যাচ্ছে না। মনি ভাইকে দেখলাম বাইরের বারান্দায় থমথমে মুখে বসে আছে। রনি ভাইকে কোথাও দেখা গেলো না। খালা রোজকার মতই রান্নাঘরে আটার রুটি বানাচ্ছেন। তাকে সাহায্য করে পাশের বস্তির একজন মহিলা। পার্বতির মা। মহিলা হিন্দু। কপালে লম্বা করে রক্তরাঙা সিঁদুর পরা থাকে। পার্বতির মাই রুটি বেলে দেয়, খালা স্যাঁকেন। সদ্য সেঁকা রুটির মৌ মৌ গন্ধে বাতাস ভরে আছে। আমি রান্নাঘরে উঁকি দেই। খালা বললেন- কিরে, ক্ষিধে লেগেছে? আমি মাথা নাড়ি। খালা বললেন, একটু বয়। আমি ফুলকপি ভাজি করছি। রুটি দিয়ে মজা লাগবে।

আমি বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে কিছুক্ষণ বারান্দায় ঘুর ঘুর করি। মনি ভাইয়ের ভাবসাব দেখেই বোঝা যায় আলাপ জমার কোন চান্স নেই। আমি বারান্দার গ্রিল দিয়ে নীচের হিন্দু বসতিটাকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করি। অন্যদিনের মতো আজ সেখানকার পরিবেশ নয়। কেমন যেন থমথমে আবহাওয়া। লক্ষ্য করলাম ছোট ছোট দলে জমাট হয়ে আলাপ করছে তারা। এমনকি ছোট বাচ্চাগুলোও মুখে আঙুল দিয়ে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে। নাক বেয়ে গড়িয়ে পড়া সর্দি ঝাড়ার কথাও তাদের খেয়াল নেই। আমার সন্দেহ আরো ঘনীভুত হলো। আমি আড় চোখে মনি ভাইয়ের দিকে তাকাই। তার মুখ দেখে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না। সকালে উঠেই ধমক–ধামক খাবার কোন ইচ্ছা নেই। হঠাৎ করেই কোথা থেকে এসে হাজির হয় ইউনুস। আমাকে দেখেই সে উদ্বিগ্ন গলায় বললো - কাল রাতে কি হয়ে গেলো খবর রাখিস? পাকিস্তানী সৈন্যরা কত মানুষ মারলো। শেখ মুজিবকে ধরে নিয়ে গেছে। এইবার ওদের কপালে দুঃখ আছে। ওদের মাংস কেটে কেটে লবণ দেবো আমরা। বাংগালীরে চিনিস না।

জানতাম তার কপালে দুঃখ আছে। মনি ভাই ভয়ানক গলায় ধমকে উলো। - চুপ কর তুই। গাধার বাচ্চা। কি বুঝিস তুই এইসবের। এইসব ঐ মালাউনদের ষড়যন্ত্র। মুসলিমদের মধ্যে ওরা ভাঙন ধরাতে চায়। এই দেশটাকে ওরা হিন্দুদের রাজত্ব করতে চায়। বেশ করছে, ক'টা মালাউন মারছে। ওদের সবক'টাকে খতম করা দরকার।

ইউনুসকে কখনো মনি ভাই অথবা রনি ভাইয়ের মুখের উপর কথা বলতে দেখিনি। আজ বোধহয় তার ঘাড়ে ভুত চেপেছে। সে ঝট করে বললো - এইসব কি কথা বলছেন মনি ভাই?

রেডিও শুনেছেন? তারা মুসলমানই মারছে বেশী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কত ছাত্র মেরেছে জানেন? আমি তো মুর্খ। কিছু বুঝিনা। কিন্তু আপনি তো বুঝেন। আপনি বলেন এই খুনোখুনি কি ভালো হয়েছে? মুসলমান হয়ে মুসলমান হত্যা? মনি ভাইকে দেখে মনে হলো সে বিস্ফোরিত হবে। কিন্তু সে নিজেকে সংবরণ করে চাঁপা গলায় বললো - মালাউনদের সাথে হাত মেলালে এইরকম তো হবেই।

পার্বতির মা এই বাসায় বহুদিন ধরেই কাজ করে। তার মুখে একটার বেশী দুইটা কথা শুনিনি। সে রান্নাঘর থেকে বিড় বিড় করে বললো - খালাম্মা, মনি ভাইয়ের আমাদের উপর এতো রাগ ক্যান? আমরা কি করছি? এইটাতো আমাদেরও দেশ। হিন্দু হয়ে কি আমরা পাপ করেছি? পূর্ব পুরুষের ধর্ম। খালা বললেন - থাক, থাক। তুমি আর এসব নিয়ে কথা বলো না। এসব রাজনীতির ব্যাপার। মনিকে তো ছোটবেলা থেকে দেখছো। তোমাদেরকে সে নিজের আত্মীয়ের মতো দেখে। ওর কথায় মনে কিছু নিও না।

মনি ভাই দাপট দেখিয়ে হেঁটে যেতে যেতে কটমটিয়ে বলে গেলো - মালাউনদের সব মালাউনদের দেশে চলে যাওয়া উচিত। বাংলাদেশ হচ্ছে মুসলিমদের দেশ। পার্বতির মা ডুকরে কেঁদে উঠলো। খালা তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছেন। ইউনুস আমার কানে কানে বললো - তুই মনি ভাইয়ের দলে যাবি না। সে স্বাধীনতা চায় না। হারামজাদা পাকিদের গোলামী করতে চায়। ওরা হচ্ছে কুত্তার বাচ্চা। মুসলমান না কচু ।

বুঝলাম ইউনুস রনি ভাইয়ের সাগরেদ হয়েছে। আমি বললাম - রনি ভাই কোথায়?
ইউনুস চাঁপা গলায় বললো–স্কুলের মাঠে। আরো অনেক ছেলেপিলেরা এসেছে। এইবার যুদ্ধ হবে। আমরা এটা চুপচাপ মেনে নেবো নাকি? কখনো না। যাবি তুই আমার সাথে? আমি মাথা নাড়ি। জানি মা এবং খালা বাধা দেবে। সুতরাং চুপি চুপি কেটে পড়ার চেষ্টা করি, লাভ হয় না। রুশীর চোখে পড়ে যাই। সাথে সাথে খবর চলে যায় মায়ের কাছে। তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা যায় ঘরের ভেতর থেকে। –খোকা, বাইরে যাবি না এখন।

এই নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করার পরিণতি ভয়ানক। কিল, চড়, থাপ্পড়। মায়ের রাগ হলে মাথার ঠিক থাকে না। ইউনুস সেটা জানে। সে শ্রাগ করলো। ইশারায় বোঝালো, পরে একসময় নিয়ে যাবে। খালা ডাকলেন- ইউনুস, তুই কোথায় চললি?
–এই তো এখুনিই আসতেছি।
–কখন আসবি তা তো জিজ্ঞেস করিনি। যাচ্ছিস কোথায়?
ইউনুস ততক্ষণে পগার পার।

২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। চারদিকে যেন একটা বিশাল আলোড়ন উঠে গেলো। সবাই জানতো এই দিন একদিন আসবেই। রাস্তায় রাস্তায় মানুষের বিদ্রোহী ঢল। খালার বাসার পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত। স্বাভাবিক ভাবেই খালু ও মনি ভাই খুবই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেছেন। তারা অনেক সতর্ক হয়ে গেছেন। মনি ভাইও ভেবেচিন্তে কথা বলে। অন্যদিকে রনি ভাইয়ের দাপট বেড়ে গেছে। সে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে চারদিকে যুদ্ধের সমর্থনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকেই শুনলাম মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে আগ্রহী। কিন্তু তাদের যথাযথ ট্রেনিং দরকার। সীমান্তের এপারে বসে সেটা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। রনি ভাই ভারতে যাবার তোড়জোড় করতে

লাগলো। বাংলাদেশ থেকে অনেকেই নাকি ইতিমধ্যে সেখানে গিয়ে যুদ্ধের কলাকৌশল শিখছে, অস্ত্র চালানো শিখছে। খালা এই কথা শুনে খুবই কান্নাকাটি করতে শুরু করলেন। এমনকি মাও রনি ভাইকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কোন কাজ হলো না। সে নিজেতো যাবেই, সাথে ইউনুসকেও নেবে। ইউনুস প্রথমে প্রচন্ড আগ্রহ দেখালেও বাসার সবার প্রচন্ড ধমকে ধীরে ধীরে চুপসে গেলো। শেষ পর্যন্ত প্রায় চুপি চুপিই রনি ভাই তার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খুলনা শহর ছেড়ে গেলো। ছাদের উপরের চিলেকোঠায় মনি ভাই তার কয়েকজন বন্ধু নিয়ে হররোজ আড্ডা বসালেও, পরিষ্কার বুঝতে পারি তারা সবাই খুবই উদ্বিগ্ন। মুসলিম লীগের সমর্থন করা আর দেশের স্বাধীনতার বিরোধীতা করা এক কথা নয়। তাদের আলাপ শুনে বুঝি তারা খুবই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে আছে। মাঝে মাঝেই তাদের তাস খেলার মানুষ হয় না। আমি সেই সুযোগে দু-একটা খেলা শিখে ফেলে তাদের সঙ্গী হয়ে যাই। রনি ভাইকে নিয়ে প্রায়ই কথা ওঠে। মনি ভাই মুখ বাঁকিয়ে বলে- এহ্, কি আমার যোদ্ধা! এক চড় দিলে চিৎপটাং হয়ে যায়।

বোঝা যায়, রনি ভাইয়ের অকস্মাৎ খ্যাতিতে মনি ভাই বেশ ঈর্ষান্বিত। এমনকি এলাকার বেশ কিছু সুদর্শনা মেয়েও আমাকে রাস্তায় থামিয়ে রনি ভাইয়ের মুক্তিযুদ্ধে যাবার কথাটা সত্যি কিনা জানতে চেয়েছে। রনি ভাই ফিরে এলে তার যে একটি গতি হয়ে যাবে তাতে আমার অন্তত কোন সন্দেহ নেই।

বাবার চিঠি পেলাম আরেকটা। ২৫শে মার্চের বর্বরতার খবর তারা পেয়েছিলেন কিন্তু যথাযথভাবে নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের বেতার কেন্দ্রগুলি খবর পরিবেশন করে এমনভাবে যে শুনে মনে হয় পাকিস্তানি বাহিনী একদল ষড়যন্ত্রকারীকে পাকড়াও করেছে। অপারেশন চলাকালে গোলাগুলিতে এইসব হিন্দুদের কেউ কেউ মারা গেছে। বাবাদের সাথে মাত্র ৫% সৈনিক হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের। তাও অধিকাংশই ডাক্তার। তাদের মূল কাজ হচ্ছে ট্রেনে পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ করা, অসুখ বিসুখে চিকিৎসা করা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরও তাদের কাজকর্মে বিশেষ কোন তফাৎ হলো না। তারাও নিজেদের ভূমিকা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে যে যার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। আমাদেরকে দেখার জন্য বাবা খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বাসা তখনও পাননি। কিন্তু মানসিকভাবে এতো বিচলিত হয়ে উঠেছেন যে মরীয়া হয়ে জেনারেল গুলের সাথে দেখা করবেন বলে স্থির করেছেন। তিনিই তখন কোয়েটা ক্যান্টনমেন্টের হর্তাকর্তা। তাকে শক্ত করে চেপে ধরতে পারলে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মা সেই চিঠি পেয়ে হাপুস নয়নে কাঁদলেন। এতো কান্নার ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হলো না। মায়ের যে অবস্থা তাতে এতো পথ ঠেলে বাবার কাছে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। স্বাভাবিকভাবেই মায়ের সাথে রুশীও কেঁদে কেটে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেললো।

ইতিমধ্যে আরেক নতুন উপদ্রবের মতো এসে হাজির হলো আমার দাঁতে ব্যথা। ছোটবেলা থেকেই মিষ্টি জিনিষে মারাত্মক আগ্রহ। সর্বক্ষণ মুখের মধ্যে লজেন্স। দাঁতের যত্ন সেই হারে নেয়া হয় না। আমার দুধ দাঁতের প্রায় সবগুলিরই মর্মান্তিক অবস্থা। দাঁত বের করে হাসলে ভয়ানক গম্ভীর মানুষের মুখেও হাসি ফুটে যায়। এমনিই ক্লাউনের মতো দেখায় আমাকে। এতোদিন মাঝে মাঝে অল্প-সল্প ব্যথা করা ছাড়া তেমন কোন ঝামেলা হচ্ছিলো না। কিন্তু হঠাৎ করেই সেটা বিপদজনক দিকে মোড় নিলো। বেশ কয়েকটা দাঁত একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। যন্ত্রণায় রাতে দুই চোখের পাতা এক করতে পারি না। খালু বললেন দাঁতের

পোকা নির্ঘাত নার্ভে গিয়ে হানা দিয়েছে। ডাক্তারের কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। সুতরাং আসফাক চাচার চেম্বারে যাওয়াই সাব্যস্থ হলো।

আসফাক চাচা বাবার চাচাতো ভাই ছিলেন। বিশাল শরীর। তাকে দেখলেই আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবার অবস্থা হতো। এতো বিশাল শরীর নিয়ে মানুষটা কিভাবে হাটেন, কিভাবে বসেন এই চিন্তায় বেশ সময় কাটিয়েছি। তার কাছে যেতে হবে দাঁত তুলতে, ভাবতেই গলা শুকিয়ে এলো। মা বললেন- ভয় পাচ্ছিস কেন? উনি তো তোকে খুবই আদর করেন।
আমি মিনমিনিয়ে বলি - দাঁত তোলার মধ্যে আদরের কি আছে?
মা হাসেন। - কতবার বলেছি দাঁত মাজতে ঠিকঠাক মতো। এখন বোঝ ঠ্যালা।
রুশীকে শব্দ করে হাসতে দেখে চোখ কটমট করে তাকাই। - তুই হাসছিস কেন?
সে দাঁত বের করে হাসে–দাঁতে পোকা।
একটা কিল দিতে ইচ্ছে হয় কিন্তু মায়ের সামনে নিজেকে সংবরণ করি। ঠিক হয় সন্ধ্যায় আসফাক চাচার চেম্বারেই যাওয়া হবে। আমার বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে গেলো। কোন কিছুই আর ভালো লাগে না। আমি মন খারাপ করে বিছানায় শুয়ে থাকলাম।

আসফাক চাচার চেম্বার ডাক বাংলার মোড়ে একটি দ্বিতল বাসার নীচের তলায়। আমাকে দেখেই তিনি বিশাল একটুকরো হাসি দিলেন। কেমন আছস্‌রে বাবা? দাঁতের বারোটা বাজিয়েছিস্? ভাবিস্‌নে। ওগুলো সব দুধ দাঁত। পড়ে গিয়ে আবার সুন্দর দাঁত উঠবে।
খুব একটা ভরসা পাই না। আসফাক চাচা আমাকে উঁচু একটা চেয়ারে বসিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দাঁত দেখলেন। একটু পর পর আপন মনে কথা বলেন - হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম। এটা একেবারে গেছে। ওটাও তো বিশেষ সুবিধার নয়। লজেন্সটা কম খাওয়া দরকার বাবা।
মা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেন - কত করে বলি, কানে নিলে তো?
পর্যবেক্ষণ শেষ হতে আসফাক চাচা গালভর্তি হাসি দিয়ে আমাকে আরো ভড়কে দিলেন। –চিন্তার কিছু নেই। যে দুটো দাঁত যন্ত্রনা দিচ্ছে আপাতত ও দুটো তুলে দেই। পরে যন্ত্রণা হলে আবার এসো একটা সুরাহা করে দেবো।
তিনি হাসিমুখেই বিশাল এক সিরিঞ্জ তুললেন। –একটু অবশ করতে হবে।

আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। কিন্তু বাস্তবে তেমন যন্ত্রনাদায়ক হলো না অভিজ্ঞতাটি। টপটপ দু'খানা দাঁত তুলে একটা কাগজে মুড়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। মায়ের হাতে টাকা পয়সা বলতে প্রায় কিছুই ছিলো না, তবুও তিনি আসফাক চাচার ফি দিতে চাইলেন। চাচা নিলেন না। হাসিমুখে বললেন- বোন তোমার কাছ থেকে আমিতো কিছু নিতে পারবো না। যদি নিতে হয় ওর বাবার কাছ থেকেই নেবো। খোকার যদি আবার কোন অসুবিধা হয় নিয়ে এসো। লজ্জা করো না। ওদের জন্য কিছুই তো করা হয় না। এইটুকু করতে পারলে ভালো লাগে।
আমি মনে মনে প্রমাদ গুনি। এই মুখো হবার কোন আগ্রহ আমার নেই। তবুও পরবর্তি এক মাসে আরো দু'বার আসফাক চাচার চেম্বারে আমাকে হাজিরা দিতে হলো। যে কয়েকটি পোকায় খাওয়া দুধে দাঁত অবশিষ্ট ছিলো সেগুলো ঝটপট বিদায় নিলো। আসফাক চাচা বিশাল হাসি দিয়ে আমার পিঠে একটা থাবড়া দিয়ে বললেন- এবার দাঁতের যত্ন করো। নতুন দাঁত গেলে আর পাবে না।

আমি মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করি, আর যাই করি দাঁতের অযত্ন করবো না। ঐ পালোয়ান সিরিঞ্জের খপ্পরে আর পড়ছি না। বিধাতা মুচকি হাসলেন বোধহয়।

শুজা রশীদ, টরেন্টো, কানাডা, ০১/০৩/২০০৬

বিঃ দ্রঃ

জনাব শুজা রশীদ প্রবাসে বসে স্বদেশে নিজের হারানো দিনগুলোকে নিয়ে 'দামামা' নামে একটি বই লিখেছেন। আসছে মে - ২০০৬ তিনি তা বই আকারে ছাপতে যাচ্ছেন। তার আগে আমাদের কর্ণফুলী'তে তাঁর এ অপ্রকাশিত বইটি ধারাবাহিকভাবে আমাদের অগনিত পাঠকদের জন্যে তিনি পরিবেশন করছেন। প্রবাসী ব্যস্ততায় লেখা তাঁর এ প্রকাশিতব্য বইটি পড়ে কেমন লাগছে পাঠকরা আমাদের ইমেইল করে জানালে আমরা তাঁকে সাথে সাথে পাঠকদের মতামত জানিয়ে দেব।